Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: শাহানাজ পারভিন

রোলঃ 227021728

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: শাহানাজ পারভিন

রোলঃ 227021728

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্নার ব্যাধি ও তার প্রতিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: শাহানাজ পারভিন, আইডিঃ 227021728 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোছা: শাহানাজ পারভিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোছা: শাহানাজ পারভিন

আইডিঃ 227021728

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

আত্মার রোগসমূহ

লোভ-দুনিয়ার লোভ 6

দীর্ঘ আশা: 8

গোস্বা, রাগ 9

মিথ্যাবলা 10

গীবত 13

কার্পণ্য, কৃপণতা 15

হিংসা-হাসাদ 16

অহংকার 17

রিয়া 20

কীনা 21

রোগের প্রতিকারসমূহ

তাকওয়াঃ 22

তওবা (পাপ থেকে ফিরে আসা) 24

ইখলাসঃ 25

যিকর ও নামাজ 26

সৎ কাজে মনোযোগী হওয়া 27

ধৈর্য ও শোকর 28

মুসলিম ভাইবোনদের সাথে ভালো সম্পর্ক 29

সুন্নাতকে অনুসরণঃ 29

রোজা রাখা 30

সচেতনতা ও আত্মবিশ্লেষণ 30

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণঃ 30

পশুত্ব চরিত্র পরিবর্জনঃ 31

আত্মাকে স্বাভাবিক রাখাঃ 31

ভূমিকা

প্রতিটি মানুষের রয়েছে দুটি উপাদান-শরীর ও অন্তর। শরীরের তুলনায় অন্তর বা মন খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ। অথচ অন্তর গোটা দেহের প্রাণকেন্দ্র ও মধ্যমণি। শরীরের নিয়ন্ত্রক ও রাজা। বাকি সব অঙ্গ তার প্রজা। তাই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে গোটা মানবদেহে অন্তরই আল্লাহর প্রধান লক্ষ্যস্থল।

এ জন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, **‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের শরীর ও বাহ্যিক আকৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।**’ এ কথা বলার সময় নবীজি (সা.) আঙুল দিয়ে নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন। (মুসলিম : হাদিস ৬৩১০)

আত্মা নামে আমরা যাকে বুঝি তাকে আরবি ভাষায় কালব বলে। শরীর যেমন সুস্থ থাকে আবার অসুস্থও হয় তেমনি আত্মাও সুস্থ থাকে আবার অসুস্থও হয়। তাই শরীর অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন, তেমনি আত্মার অসুস্থতার জন্যও চিকিৎসার প্রয়োজন। বরং সেটি ফরজ।

ইসলামে ভালো-মন্দের বিচার করা হয় অন্তর দ্বারা। যার অন্তর ভালো তার সব ভালো। যার অন্তর খারাপ তার সব খারাপ।

এ প্রসঙ্গে **রাসুল (সা.) বলেন, ‘জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো ‘কলব’ অর্থাৎ অন্তর’ (বুখারি, কিতাবুল ঈমান, হাদিস : ৫০)।**

লোভ-দুনিয়ার লোভ

দ্বিনের প্রদীপ প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের মতো ছিন্নভিন্ন করে, অন্ধকারে ছেড়ে দেয় উদ্বাস্তুর মতো। **রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া বেশি ধ্বংসকর নয়, যত না বেশি সম্পদ ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বিনের জন্য ধ্বংসকর।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৭৬)**
সীমাহীন অর্থের লোভ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় এবং দুর্নীতি ও পাপের পথে পরিচালিত করে। প্রাচুর্যের লোভ মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলে।

কথায় আছে, লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু। **মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি কখনো প্রসারিত কোরো না তোমার দুই চোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে দুনিয়ার জীবনের উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি; যাতে আমি সে বিষয়ে তাদের পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিজিক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী।' (সুরা : তা-হা, আয়াত : ১৩১)**

সম্পদের লোভের চেয়ে ভয়াবহ হলো নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভ।
নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভে মানুষ দুই হাতে মুষলধারে বৃষ্টির মতো অর্থ ব্যয় করে। **রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা সত্বর নেতৃত্বের লোভী হয়ে পড়বে। অথচ সেটি কিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে। অতএব, কতই না সুন্দর দুগ্ধ দায়িনী ও কতই না মন্দ দুগ্ধ বিচ্ছিন্নকারিনী।' (বুখারি, হাদিস : ৭১৪৮)**
পদপ্রার্থী হয়ে অর্থের বিনিময়ে নির্বাচকদের প্রভাবিত করার ঘটনা নতুন কিছু নয়।
পদ পেয়ে অহংকারবোধ এবং মানুষের কাছে প্রশংসা কামনা করে। **আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা তাদের কৃতকর্মের প্রতি খুশি হয় এবং যা তারা করেনি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে, তুমি তাদের আজাব থেকে মুক্ত মনে কোরো না। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৮)**

ভোগবাদী সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে, ‘একদিন তো মরেই যাবো, খাওদাও ফুর্তি করো।’ লোভ-লালসা মানুষকে পরকালের কথা ভুলিয়ে রাখে। আসলেই রং-রসে পূর্ণ পৃথিবীর সফর শেষ হবে মুসাফিরের। তবে আল্লাহভীতি ও পরকালে জবাবদিহির ভয় মানুষকে অল্পে তুষ্ট হতে শেখায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এক কদমও নিজের জায়গা থেকে সামনে নড়তে দেওয়া হবে না। তাহলো তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে, যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে, ধনসম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, এবং তা কিভাবে ব্যয় করেছে, সে দ্বিনের (ইসলাম) যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কি না বা কতটুকু করেছে।’

(তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৬)

রাসুলুল্লাহ (সা.) দোয়া করতেন, ‘হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তুমি আমাদের দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখিরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচাও।’

(বুখারি, হাদিস : ৪৫২২)

https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2024/08/08/1412651

দুনিয়াপ্রীতি শুধু সম্পদ ও পদের মোহকেই বলে না, বরং ইহজীবনে যেকোনো অবৈধ কামনাকে পূর্ণ করার প্রচেষ্টা ও খায়েশকেই দুনিয়াপ্রীতি বলে। অবশ্য দীনের ইলম, মারেফাতে এলাহি এবং সৎকর্ম—যেগুলোর ফলাফল মৃত্যুর পর

পাওয়া যাবে, সেগুলো যদিও দুনিয়াতেই সংঘটিত হয়; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এসবের মুহাব্বতকে দুনিয়ার মুহাব্বত বলে না, বরং এগুলো হলো আখেরাতের মুহাব্বত। দুনিয়ার জীবনের নিন্দাবাদ করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ١٨٥

'দুনিয়ার জীবনের সবকিছুই ধোঁকার সামান।'

অন্য আয়াতে এসেছে,

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۢ ٢٠

'দুনিয়ার সামানপত্র রং-তামাশা ও খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে উদ্দেশ্য না করে দুনিয়াকে আখেরাতের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যবহার করা চায়।
(আত্ তাওহীদ)

দীর্ঘ আশা:

আরবীতে বলা হয় 'আমাল'। একটি বাড়ির মালিক হয়েছে, চলবে না, আরেকটি বাড়ির মালিক হতে হবে। একটি গাড়ির মালিক হয়েছে হবে না, আরেকটি গাড়ি লাগবে। একটি ফ্যাক্টরির মালিক হয়েছে, না, হবে না। আরেকটি ফ্যাক্টরির মালিক

হতে হবে। আরো লাগবে, আরো লাগবে। 'হাল মিন মাযীদ! হাল মিন মাযীদ!' এটা হল দীর্ঘ আশা।

গোস্বা, রাগ

সীমাহীন গোস্বা। এত গোস্বা হয় যে, ইনসান না জানোয়ার, বুঝা যায় না। এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন-

أوصيني يا رسول الله

আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

لا تغضب

গোস্বা করবা না। সে আবারও বলল, আল্লাহর রাসূল! আমাকে আরেকটি নসীহত করুন। রাসূল সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো বললেন, গোস্বা ত্যাগ কর। সাহাবী তৃতীয়বার অনুরোধ করার পরও রাসূলুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই জবাব দিলেন। তো যতবারই সাহাবী নসীহতের কথা বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা বলেছেন-গোস্বা ছাড়, গোস্বা ছাড়।

রাগ বা গোস্বা অত্যন্ত খারাপ একটি আত্মিক ব্যাধি। রাগ দোজখের আগুনের একটি টুকরো। এজন্য রাগান্বিত ব্যক্তির চেহারা লাল হয়ে যায়। এর কারণে মারামারি ঝগড়া-ঝাটি, গালাগালি, এমনকি খুনোখুনি পর্যন্ত সংঘটিত হয়। এমনকি

অনেকে বৃদ্ধবয়সে এসে তুচ্ছ ঘটনায় বিবিকে তিন তালাক দিয়ে পস্তায়। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন,

«لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».

‘সেই ব্যক্তি বাহাদুর নয়, যে যুদ্ধের ময়দানে দুশমনকে নিচে ফেলে দেয়; বরং সেই ব্যক্তি বাহাদুর, যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।’

(আত্ তওহিদ)

মিথ্যাবলা

মিথ্যাকে সব পাপের জননী বলা হয়। একটি মিথ্যা থেকে শতশত পাপের সূত্রপাত হয়। তাই খুব সাধারণ বিষয়েও মিথ্যা কথা বলা ঠিক নয়। এতে করে যে কেউ ধীরে ধীরে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন মিথ্যা কথা বলতে আর দ্বিধাবোধ করে না। যে কোনো বিষয়ে মুখ দিয়ে অকপটে মিথ্যা বের হয়ে আসে।

খুব আফসোস করে বলতে হয়, আমরা দিনে দিনে মিথ্যার রাজ্যে ডুবে যাচ্ছি। আমাদের অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, আমরা কখন যে মিথ্যা কথা বলছি, সেটা নিজেরাই বুঝতে পারি না। কথায় কথায় খুব সাধারণ বিষয়ে অবলীলায় মিথ্যা কথা বলে ফেলি। অতি সাধারণ বিষয়েও মিথ্যা বলা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

আমরা যতই তাদের শিক্ষা দিয়ে থাকি, মিথ্যা বলা মহাপাপ কিন্তু নিজেরাই যদি মিথ্যা বলা থেকে বের না হয়ে আসতে পারি, তাহলে তারাও আমাদের থেকে মিথ্যা কথা বলা শিখে যায়।

তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে মিথ্যা বলাটা সহজ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মোবাইল কল বা মেসেজে। ঘরে অবস্থান করে বলে বাইরে। বাইরে কোথাও ঘুরতে গিয়ে বলা হয় অফিসে বা কর্মস্থলে। ধর্ম-কর্মে মিথ্যার মাধ্যমে ধোঁকাবাজি প্রতিনিয়ত চলছেই। মিথ্যা এতটাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, এটা কিছু লোকের অবিচ্ছেদ্য স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আমরা মিথ্যার এত কাছাকাছি বাস করছি, এটা পাপ বা সর্বজনস্বীকৃত ঘৃণ্য কাজ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি একটুও বিরক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না। মিথ্যা একাল-ওকাল দুটোই ধ্বংস করে। অ

থচ মিথ্যা বলা ছেড়ে দিলে প্রায় সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। বাঁচা যায় পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে। মিথ্যা বলার চেয়ে নিকৃষ্ট গুনা আর নেই।

তাই মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। আল কোরআন ও হাদিসে মিথ্যুক এবং মিথ্যাবাদীর ভয়ানক পরিণতির কথা বলা হয়েছে। **আল্লাহ বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ কর না।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩৬)। রাসূল (সা.) বলেন, 'মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন মিথ্যার দুর্গন্ধে ফেরেশতারা মিথ্যাবাদী থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।' (তিরমিজি : ১৯৭২)**

হিংসাপরায়ণ হয়ে মিথ্যা বলা, মন্দ ধারণা থেকে মিথ্যা বলা, বিদ্বেষী মনোভাব থেকে মিথ্যা বলা, বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে মিথ্যা বলছি অহরহ। আল্লাহতায়ালা মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করেন এবং এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আল্লাহ আল কোরআনে হুশিয়ার করে বলেন, **'সুতরাং পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক (দ্বিমুখিতা) রেখে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছে তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল তার কারণে। (সূরা তওবা, আয়াত : ৭৭)**

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, 'সত্যবাদিতা হচ্ছে শুভ কাজ। আর শুভ কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর বান্দা যখন সত্য বলতে থাকে, এক সময় আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত হয়। আর মিথ্যা হচ্ছে পাপাচার, পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, বান্দা যখন মিথ্যা বলতে থাকে, আল্লাহর কাছে এক সময় সে মিথ্যুক হিসেবে গণ্য হয়'। (বুখারি : ৫৭৪৩, মুসলিম : ২৬০৭)।

আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ বাক্য আছে। 'চিলে কান নিল' বলে অযথা চিলের পেছনে দৌড়ানো। অথচ হাত দিয়ে একবারও কানটা ধরে দেখনি আসলেই কান নিয়েছে কিনা। এটাকে বলে 'কানকথা' বা 'শোনা কথা'। কোনো কথা শুনেই এখানে-সেখানে বলে বেড়ানো হাদিসের ভাষায় এটাকেও মিথ্যা বলা হয়েছে। **রাসূল (সা.) বলেন, 'কারও কাছে কোনো কথা শোনামাত্রই তা বলে বেড়ানো মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।' (মুসলিম : ৯৯৬)।**

মিথ্যাবাদী হওয়া মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ মিথ্যাবাদীর শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, **'তাদের হৃদয়ে আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'। ওদের যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে অনাচার কর না, তারা বলে, আমরা তো শান্তি স্থাপনকারী। জেনে রাখ, ওরাই অনাচার বিস্তারকারী, কিন্তু ওদের চেতনা নেই'। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১০-১২)।**

যারা মিথ্যাবাদী, তারা এতে সাময়িক সুবিধা পেলেও ইহকালে এরা নিন্দিত হবে এবং পরকালে পাবে কঠিন শাস্তি।

(যুগান্তর ই পেপার)

গীবত

গিবত (পরনিন্দা) ও অপরের দোষচর্চা নিকৃষ্টতম অভ্যাস। পবিত্র কোরআনে এ অভ্যাসের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, **‘পেছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ-ধ্বংস।’ (সুরা : হুমাজাহ, আয়াত : ১)**

পবিত্র রমজান মাসে এই মহাব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা মুমিনের জন্য আবশ্যক।

গিবত শুধু মুখে বলার দ্বারা হয় তা নয়, বরং ইশারা-ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গির দ্বারাও গিবত হয়। গিবত করা ও শোনা দুটিই সমান অপরাধ। জীবিত ও মৃত উভয় ধরনের মানুষের গিবত করা হারাম। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, **‘তোমরা একে অন্যের দোষক্রুটি অন্বেষণ কোরো না এবং পরস্পর গিবত কোরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা ঘৃণাই করে থাকো। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।’ (হুজুরাত, আয়াত : ১২)**
এখন কথা হলো গিবত কাকে বলে? অনেকের মনে হতে পারে বাস্তবে যদি কারো মধ্যে কোনো দোষক্রুটি থাকে সেটা চর্চা করলে গিবত হয় না।

ব্যাপারটা আসলে তা নয়। হাদিস শরিফে নবীজি (সা.) গিবতের সংজ্ঞা বাতলে দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, গিবত কী? তিনি বলেন, ‘তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমার এমন কিছু বলা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়।’ পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার

ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে? তিনি বলেন, 'তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গিবত করলে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।(আবু দাউদ, হাদিস : ৪৮৭৪)

হাদিস শরিফে গিবতকে ব্যভিচার থেকে নিকৃষ্ট পাপ বলা হয়েছে। গিবতের কারণে কবরে শাস্তির কথাও উল্লেখ আছে। **ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এ দুজন কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো গুনাহের কারণে কবরে তাদের আজাব দেওয়া হচ্ছে না। এই কবরবাসী প্রস্রাব করার সময় সতর্ক থাকত না। আর ওই কবরবাসী গিবত করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনিয়ে সেটি দুই টুকরা করে এক টুকরা এক কবরের ওপর এবং এক টুকরা অন্য কবরের ওপর গেড়ে দিলেন। তারপর বলেন, এ ডালের টুকরা দুটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদের শাস্তি কমিয়ে দেবেন। (বুখারি, হাদিস : ৬০৫২)**

আর রোজা রেখে গিবত করা তো আরো ভয়াবহ। আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর ভাষ্য মতে, রোজা রেখে গিবত করলে রোজা পুণ্যহীন হয়ে যায়। রোজার মাহাত্ম্য বিনষ্ট হয়। এ বিষয়ে সতর্ক করতে গিয়ে নবীজি বলেন, যারা রোজা রেখেও এসব অভ্যাস ত্যাগ করতে পারবে না, তাদের রোজা আল্লাহর প্রয়োজন নেই। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, **রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায় কথন (গিবত, মিথ্যা, গালাগাল, অপবাদ, অভিশাপ ইত্যাদি) এবং ওই বিষয়ে আমল পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৬৮৯)**

তাই রোজা রেখে মানুষের দোষ চর্চা করা, অন্যকে গালি দেওয়া, অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি সব ধরনের নিকৃষ্ট কাজ ত্যাগ করা উচিত। মহান আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

কার্পণ্য, কৃপণতা

সম্পদের মোহই মূলত কৃপণতার মূল। আর সম্পদের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে। ফলে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণেই কুরআনে করীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ١ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ١ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ١ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ١ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۠ ۱۸۰

'আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কেয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের স্বত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

«وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ».

'তোমরা লোভকে নিয়ন্ত্রণ করো। কারণ এটা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।'

বাস্তবিকপক্ষে সম্পদের মোহ মানুষকে আল্লাহ তাআলা থেকে উদাসীন করে দেয়। এই সম্পদ মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ এক ফিতনা। অবশ্য শুধু সম্পদ কোনো

নিন্দনীয় ব্যাপার নয়; বিশেষত যদি সে সম্পদ দীনি কাজে ব্যয় করা হয়। নতুবা প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ থাকলে কোনো অসুবিধে নেই, যাতে কারও কাছে ভিক্ষার হাত বাড়াতে না হয় এবং আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা যায়।

হিংসা-হাসাদ

হিংসা কাকে বলে? কারো মধ্যে কোনো গুণ দেখে এই কামনা করা যে, এটা নষ্ট হয়ে যাক। এটা হল হিংসা। আর এই আশা করা যে, তার মধ্যে যে গুণ আছে থাকুক তবে আল্লাহ! আমাকেও তা দান কর। এটা হিংসা না, এটাকে বলা হয় গিবতা বা ঈর্ষা। গিবতা জায়েয, কিন্তু হাসাদ বা হিংসা হারাম। হাদীস শরীফে আছে, হিংসুক জান্নাতে যাবে না।

কোনো ব্যক্তিকে আরাম আয়েশ বা প্রাচুর্যপূর্ণ অবস্থায় দেখে তার সে নেয়ামত দূরীভূত হয়ে নিজের জন্য হাসিল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করাকে হিংসা বলে। হিংসা অত্যন্ত জঘন্য একটি ব্যাধি। **আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে বলেন, 'আমার বান্দার ওপর নেয়ামত দেখে হিংসাকারী কেমন যেন আমার সেই বণ্টনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট, যা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে করেছি (ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন: ৩/২৯২)।'**

রসুল (সা.) ইরশাদ করেন,

«إِيَّاكُمْ وَالْـحَسَدَ، فَإِنَّ الْـحَسَدَ يَأْكُلُ الْـحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْـحَطَبَ».

'হিংসা নেকিসমূহকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দেয়, যেমন আগুন শুকনো লাকড়িসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়। অবশ্য অন্যের কোনো নেয়ামত দেখে সেটা তার মধ্যে বহাল থেকে নিজের জন্য হাসিল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা, যাকে গিবতা বা ঈর্ষা বলে, সেটা বৈধ।'

(আত্ তাওহীদ)

অহংকার

তাকাব্বুর বা অহংকারের অর্থ হলো প্রশংসনীয় গুণাবলির মধ্যে নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, হক ও সত্যকে অস্বীকার করা। যখন মানুষ নিজের ব্যাপারে এরূপ ধারণা পোষণ করে এবং আল্লাহর দেওয়া গুণসমূহকে নিজের কৃতিত্ব মনে করে, তখন তার নফস ফুলে ওঠে। এরপর কাজে-কর্মে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ রাস্তায় চলার সময় সঙ্গীদের আগে আগে চলা, মজলিসে প্রধানের স্থানে বা সম্মানিত স্থানে বসা, অন্যদেরকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখা বা আচরণ করা অথবা কেউ আগে সালাম না দিলে তার ওপর গোস্বা হওয়া, কেউ সম্মান না করলে তার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া, কেউ সঠিক উপদেশ দিলেও নিজের মর্জির খেলাফ হওয়ায় সেটাকে অবজ্ঞা করা, হক কথা জানা সত্ত্বেও সেটাকে না মানা, সাধারণ মানুষকে এমন দৃষ্টিতে দেখা, যেমন গাধাকে দেখা হয় ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেক আয়াতে 'অহংকার'-এর নিন্দাবাদ করা হয়েছে। অহংকারের কারণেই ইবলিস বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অহংকারের ফলেই আবু জাহেল মহানবী (সা.)-কে সত্য জেনেও অস্বীকার করেছে। এর আগে বহু সম্প্রদায়কে অহংকারের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। সুতরাং অহংকার শব্দটিকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, তা সর্বাবস্থায়

হারাম এবং এর পরিণাম হলো ধ্বংস ও জাহান্নাম। মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَاۙ ۰۰۳۶

‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তার সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না। আর সদয় ব্যবহার করো মাতা-পিতার সঙ্গে, নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে, এতিম, মিসকিন, আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সঙ্গী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীর সঙ্গে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না তাদের, যারা দাম্ভিক ও অহংকারী।’[10]

হযরত লোকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًاؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍۚ ۰۰۱۸

‘তুমি অহংকারবশত মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না। আর জমিনে দম্ভভরে চলাফেরা কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’

রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ করেন,

قِيْلَ ادْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ۰۰۷۲

‘অহংকারীদের বলা হবে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো; চিরকাল অবস্থানের জন্য। কতোই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।’

(আত্ তাওহীদ)

রিয়া

রিয়া বলা হয় নিজ ইবাদত ও ভালো আমলের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে বড়ত্ব ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করা। এটা ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। কেননা ইবাদতের দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এখন যেহেতু এই আমলের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্য শরিকও চলে এসেছে, তাই একে 'শিরকে আসগার' বা ছোট শিরক বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَآ اُمِرُوٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ ٥

'মানুষকে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করার হুকুম করা হয়েছে।'

রসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে তিন শ্রেণির ব্যক্তিকে অধোমুখে করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তারা সবাই হবে রিয়াকার।' (মুসলিম শরীফ: ১৯০৫)

তারা সারা জীবন দীনের পথে থেকেও অন্তরের একটি রোগের কারণে সবার আগে জাহান্নামে যাবে। রিয়াকে 'শিরকে খফী' বা গোপন শিরকও বলা হয়।

কীনা

কীনা কাকে বলে? এটাও হিংসার কাছাকাছি। মনে মনে জ্বলতে থাকা যে, এই গুণটা তাকে কেন দেওয়া হল! সে কেন এই জিনিসের মালিক হল! এই ইলম তাকে কেন দেওয়া হল ইত্যাদির নাম হল কীনা।

রোগের প্রতিকারসমূহ:

এর চিকিৎসা মূলত আত্মিক পরিশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে করা হয়।

এখানে কিছু উপায় দেওয়া হলো, যার মাধ্যমে নফস বা আত্মার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে:

১. ঈমান পরিশুদ্বকরনঃ

তাযকিয়াতুন নফসের চাবি হল ঈমান।আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনলে আত্মশুদ্বি হবে না।ঈমানদারদের জন্যেই আত্মশুদ্বি।কাফিরদের জন্য আত্মশুদ্বি নয়।সত্যিকারের আত্মশুদ্বি অর্জন করতে হলে ঈমানকে তাজা এবং শক্তিশালী করতে হবে।আর এই ঈমানকে তাজা করার জন্য ইলেম অর্জন করতে হবে।ইলম ছাড়া ঈমান কখনও তাজা হবে না।আল্লাহ বলেন,

পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। আলাকঃ১-৫] এবং সঠিকভাবে তাউহিদের পরিচয় লাভ করা। তাউহিদ না জানলে ঈমানদারের দাবী করেও মুশরিক হয়ে থাকতে পারে।

তাকওয়াঃ

তাকওয়া শব্দের অর্থ হল আল্লাহকে ভয় করা,সাবধান থাকে,সতর্ক থাকা,বিরত থাকা ইত্যাদি।শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ পাকের ভয়ে যাবতীয় পাপাকার্য থেকে বিরত থাকের নাম হল তাকওয়া।তাকওয়ার দ্বারা যেকেউ নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে।।আল্লাহ বলেন,

“তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন”। [বাকারাঃ১৯৪]

“পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে,তার ঠিকানা হবে জান্নাত”। [নাযিয়াতঃ৪০-৪১]

তাওয়াক্কুলঃ

সর্বাবস্থায় এক আল্লাহের উপর কেবল নির্ভর হওয়াকে তাওয়াক্কুল বলা হয়।তাওয়াক্কুলের ধারনা তাওহীদ হতে এসেছে।এক সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর অন্য কোন শক্তি উপর নির্ভর করা ইসলামবিরোধী।

ইমাম গাযযালি(র.) বলেন,”তাওয়াক্কুলের অবস্থা তিন ধরনের হয়।প্রথম অবস্থা হল এমন যে সে সাধারণভাবে আল্লাহের উপর নির্ভর করবে।দ্বিতীয়ত,তাওয়াক্কুস্কারী ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে যে একজন শিশু তার প্রতি ঠিক যেমন নির্ভর করে অর্থাৎ তার মাতা ছাড়া আর কারও আশ্রয় লাভ করে না ঠিক তদ্রুপ ঐ ব্যক্তি আল্লাহের প্রতি এমন নির্ভর করে থাকবেন। আর সবশেষ

স্তর হল এমন যে সে পৃথিবীর কোন কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নয় এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি।আত্মশুদ্বির জন্য এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "তোমরা এমনভাবে তাওয়াক্কুল যেমনিভাবে একটি পাখি আল্লাহের প্রতি তাওয়াক্কুল করে।অর্থাৎ সে সকালে বের হয় অনাহারে আর বিকালে ঘরে ফিরবার পূর্বে পেটপূর্ণ হয়ে ফিরে আসে"। [তিরমিযী]

আল্লাহ বলেন, "এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।" [তওবাঃ১২৯]

তওবা (পাপ থেকে ফিরে আসা)

নিজের সমস্ত পাপ ও ভুল আচরণ থেকে তওবা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তওবা হলো আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া এবং পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য দৃঢ় সংকল্প করা।

তওবা অর্থ হল অনুতপ্ত হওয়া,লজ্জিত হওয়া, ফিরে আসা,প্রত্যাবর্তন করা ইত্যাদি।অর্থাৎ,আল্লাহের হুকুম অমান্য করে বা সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কর্তৃক চরম অনুশোচিত হয়ে আল্লাহর কাছে অপরাধ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম হল তওবা। অর্থাৎ,গুনাহ করার পর সেখান তা থেকে যদি কেউ পরিত্রান পেতে চায় এরজন্য তাকে আল্লাহের কাছে সর্বপ্রথম একনিষ্ঠভাবে তওবা করতে হবে যে আরধনার মাধ্যমে যেকেউ আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভ এবং আত্মপরিশুদ্বতা অর্জন করতে পারে।তওবার মানে শুধু এই না যে সে পাপের জন্য কেবল ক্ষমা চাবে না বরং সে পাপ কাজটি না করার জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে।অন্যথায় তা তওবা হবে। আল্লাহ বলেন,

“নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন”[বাকারাঃ২২২]

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন, “তওবাকারীদের কোন গুনাহ থাকে না।।”

অর্থাৎ, তওবার দ্বারা অতি সহজে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي " .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সুত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিতঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আমার গোস্বাকে আমার রহমাত অতিক্রম করেছে। (ই.ফা. ৬৭১৭, ই.সে. ৬৭৭৩)

ইখলাসঃ

মুমীনগণ হৃদ্বের পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করে চলে।তারা সর্বদা আল্লাহের ধ্যানে মশগুল থাকে।তারা তাদের চিন্তা-ধারার সময় আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আনেন না।যাবতীয় সন্দেহযুক্ত কাজ বর্জন,বিবেকবিরোধী কাজ বর্জন করা এবং যা আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায় এমন কাজ বর্জন করা পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম সহায়ক।আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন ও পার্থিব মোহ এড়ানোর মাধ্যমে মূমীনগণ অন্তরে পবিত্রতা অর্জন করেন।

আল্লাহ বলেন, “আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্যে।” [আনআমঃ১৯২]

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন,“ইখলাসওয়ালাদের জন্য সুসংবাদ হোক।তারা অন্ধকারে চেরাগস্বরুপ।তাদের দ্বারা কঠিন হতে কঠিন ফিৎনা দূর হয়”।[বায়হাকি]

যিকর ও নামাজ

আল্লাহর নাম স্মরণ করা, যেমন দুআ বা যিকর করা, হৃদয়কে প্রশান্তি দেয় এবং আত্মিক পরিশুদ্ধি আনে। নিয়মিত নামাজ পড়া ও আল্লাহর সাথে সংযোগ বজায় রাখা একদম গুরুত্বপূর্ণ।

যিকির মানেই আল্লাহকে স্মরণ করা। সকল কাজ সুন্নাত তরীকায় সম্পাদিত হলেই তা যিকিরে পরিণত হবে। নামায, রোজা,হজ্ব সব কিছুর মধ্যই যিকির আছে। তবে লিসানি বা যবানের সর্বত্তোম যিকির হলো কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত।

যে সকল জায়গায় যে মাসনুন দুআগুলি আছে তা আদায় করাও যিকির।

যিকিরের অনেক ফযিলত আছে।

আল্লাহ বলেন,

“সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো” [বাকারাঃ১৫২]

“ মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল বিকাল আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর” ।[আহযাবঃ৪১-৪২]

কুরআন তিলাওয়াতের আরো গুরুত্ব-

কুরআন তিলওয়াত হল নফল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত।কুরআন তিলওয়াতের মাধ্যমে একজন বান্দার সাথে আল্লাহ পাকের কথোপকন হয় এবং যিকিরের মর্যাদা লাভ করতে পারে।তার মানবিক গুণাবলী বৃদ্বি পায়।**রাসূল(সাঃ) বলেন, “লোহার উপর যেমন মরীচা পড়ে তেমনিভাবে মানুষের অন্তরের উপর মরীচা পড়ে।আর এই মরীচা দূর করার উপায় হল বেশি বেশি করে কুরআন তিলওয়াত এবং মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা।”**

সৎ কাজে মনোযোগী হওয়া

সবসময় সৎ ও ভালো কাজ করা এবং হালাল উপার্জনে মনোযোগী হওয়া। এতে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং নফসের অপতৎপরতা কমে আসে।

আত্মশুদ্বি করার আরেকটি বিশেষ রাস্তা হল নেক আমল করা।শুধুমাত্র ঈমান থাকলে হবে না।ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করতে হবে।আর মানব সৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য হল আল্লাহ পাকের জন্য ইবাদত তথা নেক আমল করবে।এই ইবাদত –বন্দেগীর দ্বারা একজন বান্দা আত্মশুদ্বি অর্জন করতে পারে।**আল্লাহ বলেন,**

"আমি জীন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।" [যারিয়াতঃ৫৫]

ধৈর্য ও শোকর

জীবনের সব অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর দানে শোকর করা। এর মাধ্যমে মানুষ আত্মিক শান্তি লাভ করে এবং নফসের বিরুদ্ধাচরণ কমে যায়।

সবর অর্থ হল ধৈর্য।আর ধৈর্য হল ঐ বিষয়টি যার সাহায্যে একজন মানষ তার বিপদ-আপদ,সুখে-দুখে,ক্ষুধা-তৃষ্ণায়,অত্যাচার-অবিচার ইত্যাদি সর্বাবস্থায় এক আল্লাহের ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের পথ অনুসরণ করে।ধৈর্যের তিনটি স্তর রয়েছে।এক ধরনের ধৈর্য আছে যাতে মানুষের ভিতর কখন সবর থাকে আবার কখন থাকে না।আবার আরেকটি স্তর হল কখনো মন্দ অবস্থায় সে দিশেহারা হবে না।আর সর্বশেষ স্তরটি হল এমন যে সে কখনো দুঃখ-কষ্টের জন্য কখনও বিচলিত হবে না।এ সর্বশেষ স্তরের দ্বারা যে কেউ তার এই সবরের গুণে সূফিবাদের চরম লক্ষে পৌছে যায়।ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, "ধৈর্য হল শয়তানের প্ররোচনা অ আত্মার নিম্নতর প্রবৃত্তি সম্পর্কে হুশিয়ারীতে পূর্ণ বিশ্বাস"। সবরের দ্বারা যে আল্লাহ পাকের ভালবাসা একান্তভাবে অর্জন করা যায় তা নিমোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয়।

আল্লাহ বলেন,**"হে মুমিন গন! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[বাকারা]**

শোকর আদায় করাঃ শোকর শব্দের অর্থ হল কৃতজ্ঞতা।আল্লাহ পাক একজন মানষকে যে হাত,পা।চোখ,নাক,কান,মুখ,বাতাস,রিযিক,পানি দিয়েছে তার জন্য আল্লাহের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নাম হল সাধারণভাবে শোকর।শোকর আদায়ের মধ্য দিয়ে একজন বান্দা আত্মশুদ্বিতা অর্জন করতে পারে।

আল্লাহ বলেন, **"যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব" [ইব্রাহীমঃ৭]**

মুসলিম ভাইবোনদের সাথে ভালো সম্পর্ক

মুসলিম সমাজের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং মাওয়াহিব (দান) করা। এটি সমাজে ভালোবাসা ও শান্তি আনে এবং আত্মাকে পবিত্র করে।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পাদনঃ দাওয়াত এবং তাবলীগী কাজের দ্বারা আত্মশুদ্বি অর্জন করা যায়।

আল্লাহ বলেন, **"ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর উত্তম কথা কার হতে পারে যে কথা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে আর নিজে নেক আমল করে আর বলে আমি মুসলমানদের একজন।"[হামীম-সিজদাহঃ৩১]**

সুন্নাতকে অনুসরণঃ

সুন্নাত অর্থ হল পথ।রাসূল(সাঃ)এর পথকে অনুসরণ করাকে সুন্নাত বলা হয়।সুন্নাতকে অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর একজন প্রিয়বান্দা আত্মশুদ্বি অর্জন করতে পারে।মুসলমান হিসেবে সুন্নাতকে অনুসরণ করা সকলের জন্য জরুরি।

আল্লাহ বলেন, ''**বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন।" [ইমরানঃ১৩১]**

"যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহ্রই হুকুম মান্য করল।"[নিসাঃ৮০]

রোজা রাখা

রোজা রেখে শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নফসের প্রবৃত্তির ওপর শক্তি প্রদর্শন করা। রোজা নফসের রোগ নিরাময়ে খুবই কার্যকর।

সচেতনতা ও আত্মবিশ্লেষণ

নিজেকে আত্মবিশ্লেষণ করা এবং নিজের আচরণ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি সচেতন হওয়া। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভুল এবং অশুদ্ধ আচরণ থেকে ফিরে আসতে পারি।

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণঃ

একজন শিক্ষকের প্রতি তার ছাত্র পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত পূর্ণ শিক্ষা অর্জন করতে পারে না তেমনিভাবে আল্লাহের প্রতি সকল ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য না করা পর্যন্ত সে পরিপূর্ণ মারিফত অর্জন করতে পারবে না।তাই তাই আত্মশুদ্বির অন্যতম উপায় হল অন্যতম লক্ষ্য হল এক আল্লাহের প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

পশুত্ব চরিত্র পরিবর্জনঃ

শয়তান হল মানুষের চির শত্রু।শয়তান সর্বদা মানুষকে বিভিন্ন ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ব করে।এর দ্বারা কখনও আত্মশুদ্বি সম্ভপর নয়।তাই আত্মশুদ্বি অর্জনের জন্য গীবত করা,মিথ্যা বলা,অপবাদ দেওয়া,উপহাস খাওয়া,সুদ খাওয়া,ঘুষ খাওয়া,ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদির মত জঘন্য অপরাধ হতে নিজেকে সার্বক্ষণিক মুক্ত রাখতে হবে।

আল্লাহ বলেন, **"যে নিজেকে (আত্মাকে) শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনে রেথ হয়"। [শামসঃ৯-১০]**

.

আত্মাকে স্বাভাবিক রাখাঃ

আত্মাকে পাপমুক্ত রাখার মাধ্যমে একজন বান্দা অন্তরে বিশুদ্বতা অর্জন করতে পারে।

রাসূল(সাঃ) বলেছেন, **"শরীরের দেহে একটি মাংস আছে যদই তা পরিশুদ্ব হয় তবে গোটা শরীর পরিশুদ্ব হয়।আর যদি তা খারাপ হয়,তবে সমস্ত শরীরই খারাপ হয়।মনে রেখো তা হল কাল্ব বা দিল"।[বুখারী ও মুসলিম]**